চৈতন্যডোবা ও ভাবনা আলেখ্য

অরিজিৎ চক্রবর্তী

উ তোত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়ের পত্য উশতী সুবাসাঃ' - ঋগ্বেদ ১০.৭১

পরচিত্ত অন্ধকার তো বটেই নিজের মনও দুর্জ্ঞেয়। মানব মনের জটিলতার উৎস এবং এই জটিলতাজাত যন্ত্রণায় উপশমের উপায় নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ কম চিন্তাভাবনা করেনি। স্বভাবতই এই মননশক্তির অস্তিত্ব ও অবদান স ম্পর্কে নিরন্তর সচেতন থাকাই হল মনুষ্যত্বের অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু এই আত্মসচেতনতার অর্থ কি এক তীব্র ও অনমনীয় স্ব কীয়তাবোধ যা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে তার পরিপার্শ্বের বস্তুজগৎ থেকে এবং নিক্ষেপ করে অতীন্দ্রিয় মনোগামিতার কুহেলিকায়? অথবা অমিত মননশক্তির অধিকার কী মানুষকে বস্তুজগতের প্রভুত্বে অভিষিক্ত করে এই অর্থে যে, বস্তু তার স্ব তন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে মননের সক্রিয়তার ওপর? এককথায়, মানুষের মননে যথোপযুক্ত গুরুত্ব ও মূল্য আরোপ করার অর্থ কী বস্তুর ভূমিকার গৌণকরণ? এই প্রশ্নাবলীর ইতিবাচক উত্তর পাওয়া যায় ভাববাদী দর্শনে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৬৬তম শ্লোকে) যে শান্তির নিয়তপুর্ববর্তী শর্ত হিসেবে ভাবনার উল্লেখ করা আছে তার স্বরূপ উন্মে াচন করে মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন - 'বিজাতীয় প্রত্যয় বা জ্ঞানের দ্বারা যা বাধাপ্রাপ্ত নয় তেমন নিরন্তর সজাতীয় প্রত্যয়ের প্রবাহরূপী নিদিধ্যাসনকেই ভাবনা বলা হয়েছে।' আমি যদি ঠিক করি যে, একন আমি আমার শ্বাস প্রশ্বাসের গতির দিকে লক্ষ্য রাখবো অথবা রাসেল যেভাবে 'এক' সংখ্যাটির রাশিতাত্ত্বিক লক্ষণ দিয়েছেন তা নিয়েই কেবল ভাববো - দু-এক মিনিটের মধ্যেই আমি লক্ষ করি (তৎকালেই অথবা পশ্চাদবলোকর করে) যে, আমি অন্য কিছু নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছি - তার কারণ আমার চিত্ত অবশ্য কখনই একটিই মাত্র জ্ঞান নিয়ে থাকে না। জ্ঞান থেকে জ্ঞানান্তরে ধারাপ্রবাহের মতো পরিণামশালিনী আমাদের চিত্ত। এখন এই জ্ঞানগুলি যদি সমান বা সমজাতীয় বিষয়ক হয় - অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে একত্ব সংখ্যার জ্ঞান হল, দ্বিতীয় ক্ষণেও একত্ব সংখ্যার জ্ঞান হল, তৃতীয় ক্ষণেও যেই একত্বসংখ্যারই জ্ঞান আর একটি তৃতীয় ক্ষণেও সেই একত্বসংখ্যারই জ্ঞান আর একটি তৃতীয় জ্ঞান হল - এমন এক বিষয়ক ধারাবাহিক জ্ঞান হতে থাকলে তাকে বলা যেতে পারে চিত্তের একতানতা। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে ওঙ্কার তথা প্রণবের অর্থ বিষয়ে এমন ব্যবধানশূন্য অবিক্ষিপ্ত প্রত্যয় প্রবাহকে 'তদর্থভাবনম্' বলা হয়েছে। একই বিষয় না হয়ে একজাতীয় বিষয় হলেও হবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা তাঁদের ভজনীয় মেঘশ্যাম বংশীবাদকের বিষয়ে এমন নিরন্তর ধ্যানের সৌকর্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ভোর থেকে রা ত্রি পর্যন্ত অষ্টকালীন লীলার চিন্তা করতে উপদেশ করেন। এই লীলাচিন্তা সরস বলে, বৈচিত্রময় বলে, হাস্যকরুণ্দ্রশৃঙ্গারাদি নানান উপভোগ্য ভাবের আকর বলে এতে নিরন্তর মগ্ন থাকা সম্ভব। অথচ প্রতিটি জ্ঞানই কৃষ্ণ বিষয়ক হওয়ার বিষয়ের একত্ববশত তাদের স্বজাতীয়ত্ব রক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, কট্টর অদ্বৈতবাদী এই রসস্বাদকে 'ভাব' বলবেন, 'ভাবনা' বলবেন না। বৈষ্ণবরা যে একেই ভাবনা বলেন তা 'ভাবনাসারসংগ্রহ' নামে প্রখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়।

জ্ঞানপ্রক্রিয়ার স্বপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভাববাদ আবিষ্কার করে মননের সক্রিয় ও মুখ্য ভূমিকা। মানুষের অভিজ্ঞতা-স াপেক্ষ বস্তু সম্পর্কে যে জ্ঞান তা আদৌ বস্তুনির্ভর নয়, তা প্রকৃত পক্ষে মননির্ভর - এই হল ভাববাদীদের মূল সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি এই যে, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুজগৎ সম্পর্কে যে সংবেদনের সৃষ্টি হয় সেই সংবেদনের সমষ্টির সঙ্গে যথার্থ জ্ঞানের সমীকরণ করা উচিত নয়। কারণ বস্তুসম্পর্কিত ইন্দ্রিয়বাহী ধারণা বস্তুর বাহ্যিক আকৃতি ও প্রকৃতি বিষয়ে তথ্যের যোগান দেয় মাত্র, কিন্তু সস্তুর নিহিতার্থ ও ব্যঞ্জনা এই ধারণার মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয় না। বস্তুজগতে জন্ম, ক্ষয় ও বিনাশের অহরহ লীলাখেলার মধ্য দিয়ে বাহ্যত বস্তুর ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও প্রতিটি বস্তুরই এক চিরন্তন স্বরূপ আছে এবং এই স্বপ কালজয়ী বলেই বস্তুর জাগতিক বিনাশের পরেও বস্তুসম্পর্কিত জ্ঞান অক্ষয় হয়ে থাকে। এই চিরন্তন স্বরূপের পূর্ণ অনুধাবনই হল প্রকৃত জ্ঞান এবং এই তার চরিত্রগত কারণেই অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু, এই অনুধাবন সম্ভব হয় কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধির দ্বারা, যে উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য তার স্থিরতা এবং যা জন্মলাভ করে মননের গর্ভে। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার দ্ধ হয়ে গেলেও মননের উপলব্ধি ক্ষমতা প্রতিহত হয় না; স্বভাবতই উপলব্ধি হল মননের একান্ত নিজস্ব, স্বাধীন ত্রিয়া। অন্যভাবে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের অর্ন্তলোক থেকে বস্তুর চিরন্তন সত্তাটিকে নিজের সত্রিয়তায় বের করে নিয়ে এসে উপলব্ধির আলোকে এই সত্তাসম্পর্কিত অভ্রান্ত জ্ঞানের জন্ম দেয় মানুষের মননশত্তি। অর্থৎ, বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের উৎস ও স্রষ্টা হল মানুষের মন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ন্যায়দর্শনে কিন্তু জ্ঞান বা জ্ঞানধারাকে ভাবনা বলা হয়নি। স্মৃতির কারণরূপী একরকম সংস্কার বা প্রবণতাকেই ভাবনা বলা হয়েছে। এখানে 'সংস্কার' কথাটির পারিভাষিক অর্থ স্পষ্ট করা দরকার। এমনিতে সংস্কার হল যে - কোনও রকমের ছাপ বা অভ্যাসজনিত প্রবণতা। ন্যায়দর্শণে তিন রকম সংস্কার মানা হয়েছে। তার মধ্যে দুটি হল জড় পদার্ধের ধর্ম ঃ বেগ আর স্থিতিস্তাপকতা। বেগ থাকে জলে, বাতাসে, আগুনে, মনে (মন ইন্দ্রিয়; আত্মার মতো চেতনা বা জ্ঞানের আশ্রয় নয় - তাই তাকে অচেতন বা জড়ই বলতে হবে)। স্থিতিস্থাপকতার ফলে ধনুকের ছিলা টেনে তাকে বাঁকানোর পর আবার ছেড়ে দিলে জ্যা-মুত্ত ধনুক পূর্ব আকৃতিতে ফিরে যায়। বেগের ঠিক উলটো গুণ হল এই স্থিতিস্থাপকতা। বেগ যে ত্রিয়ার জন্ম দেয় সেই ত্রিয়াতে বেগবান পদার্থ নতুনস্থানে পৌঁছে যায়। স্থিতিস্থাপকতা যে ত্রিয়া উৎপন্ন করে তার ফলে পদার্থটি আবার পুরনো স্থানে ফিরে আসে - যেমন টেনে ছেড়ে দেওয়া রবারের দাড়ি। এইরকমেরই এক তৃতীয় প্রকারের সংস্কার হল ভাবনা। পাঁচবছর আগে একটি কবিতায় পড়েছিলাম, 'অসম্বৃত অবস্থায় দেখেছে রাত্রিকে / সূর্য তাই এখন টানে রত্তগাঁজাদম / সে বলে, 'মন ঘুরিয়ে দেবো অন্য কারো দিকে-'/ কিন্তু তার শত্তি বড় কম' (রূপ ঃ জয় গোস্বামী) হঠাৎ কোনও সাহিত্য আড্ডায় বসে সেই পঙত্তি মনে পড়ে গেল। অভিজ্ঞতা ও স্মরণের এই দীর্ঘ ব্যবধানকালে পঙত্তিটি কিসের বিষয়রূপে আত্মায় সঞ্চিত ছিল? এমন তো নয় যে , নিচচারভাবে পঙত্তিটি কোনও - না- কোন নিরস্তর জায়মান জ্ঞানধারাতে বারবার পঠিতই হচ্ছিল এই পাঁচবছর! এই রহস্যের কিনারা করার জন্যই 'ভাবনা' নামের সংস্কারের অনুমান করেছেন নৈয়ায়িকরা। নিশ্চয়াত্মক অনুভব যা আমাদের মনকে নাড়া দেয় - অর্থাৎ যাকে আমরা নিতান্ত উপেক্ষায় উড়িয়ে দিই না - তা নিজে নষ্ট হবার আগে আত্মার একটি ভাবনা তৈরি করে দিয়ে যায়। যাকে বলে একটি দাগ রেখে দেওয়া। বিষ্ণু দে তাঁর কোনও কবিতায় সংস্কারকে তুলনা করেছেন ব্যাথার স্নায়ুতে মরচের দাগের সঙ্গে। এমন দাগ যা রোদে জলে মোছে না। তার 'আয়ু যে দুরন্ত লোহার'। ভবিষ্যতে যদি কোনও অন্য অনুভব এসে ওই দাগে হাত ছোঁয়ায় তা হলে ভেতরকার পরিবেশ অনুকুল হলে পূর্বানুভব থেকে একটি অনুরূপ স্মৃতি জেগে ওঠে। মজার কথা, ন্যায় মতে ঈশ্বরও একজন আত্মা। অথচ ঈশ্বরের জ্ঞান সবই সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষাত্মক বলে তাঁর স্মৃতি বা ভাবনা সংস্কার হয় না। কাজেই বলা যেতে পারে ভগবানের কিছুই মনে থাকে না।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের মনন পরিগণিত হয়ে থাকে তার মস্তিষ্কের ত্রিয়ারূপে এবং এই বিচারে মননও একধরনের বস্তুর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য মেনে নিতেই হয়। কারণ মনন নিঃসন্দেহে জ্ঞানের বিষয়ী এবং বস্তু হল জ্ঞানের বিষয়। যে বস্তুজগৎ মানুষের অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ তার সীমানার বাইরে মননের অবস্থানেই হল জ্ঞানের প্রাথমিক শর্ত। ঠিক এই অর্থেই জ্ঞানের বিষয়ী হিসাবে মনন সতত আত্মসচেতন। কিন্তু এই আত্মসচেতনতার অর্থ একপক্ষীয় আধিপত্য নয়। অর্থৎ, বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র মননের অবদানে এবং বস্তুর ভূমিকা এক্ষেত্রে নিতান্ত গৌণ - এই ধারণা ভ্রান্ত। একইভাবে মননের সত্রিয়তা ছাড়া বস্তুর কোনও অস্তিত্ব নেই - এই ধারণাও অবাস্তব। বস্তুর অস্তিত্ব

প্রতিষ্ঠিত হয় তার নিজস্ব উপাদানের ভিত্তিতে। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগেও বস্তু ছিল এবং ভবিষ্যতে কোনদিন মানবগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও বস্তুর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে না। মননক্রিয়া যদি রুদ্ধ হয়ে যায় তবুও সূর্যের তাপ বিকিরণ অব্যাহত থাকবে, অনুকূল বায়ুর প্রভাবে মেঘের সঞ্চার হবে আকাশে এবং নদী প্রবাহিত হবে স্বাভাবিক গতিতে। দ্বিতীয়ত, বস্তুর ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করে মনন নিঃসন্দেহে বস্তুকে অর্থময় ও মূল্যময় করে তোলে, কিন্তু মনন এই ব্যঞ্জনার স্রষ্টা নয়। বস্তুর অন্তর্ভুত উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবেই সঞ্জাত হয় এই ব্যঞ্জনা। অবশ্য মননের মাধ্যমেই এই ব্যঞ্জনা স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু এই স্বীকৃতির অভাবে বস্তু কখনই স্বধর্মচ্যুত হয় না। যেমন মানুষ অবশ্যই দাবি করতে পারে যে, ' গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর-সুন্দর হল সে।' কিন্তু মননের সক্রিয়তায় এই যে গোলাপটি প্রেয় হয়ে উঠল মনন নিষ্ক্রিয় থাকলেও তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিতই থাকত। তৃতীয়, মননের ক্রিয়া স্পষ্টতই নির্ভরশীল বস্তুর ওপর। বস্তু আছে বলেই মনন তার সম্পর্কে জ্ঞানলাভে উদ্যোগী হয়।

অবশ্য মননের মূল ক্রিয়ার চরিত্রে কোনও পরিবর্তন নেই। ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যে যত পরিবর্তনই দেখা দিক না কেন তাকে সুবিন্যস্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার কাজে মননের কোনও বিরতি নেই। কিন্তু মনন-ক্রিয়ার এই চিরন্তনতা কোনও অতিপ্রাকৃত, অপার্থিব ও অনন্ত শক্তির প্রমাণ নয়। কারণ মনন এই শৃঙ্খলার নীতি পালনের শিক্ষা পায় বস্তুগতেরই মর্মলোক থেকে এবং বস্তুজগতে এই নীতির বিরামহীন সক্রিয়তা দেখেই সে এই নীতির প্রতি অবিচল আনুগত্যে তৎপর হয়। অতএব বস্তু ও মননের মধ্যে কে মুখ্য, কে গৌণ - এই বিতর্ক অর্থহীন। জ্ঞানক্রিয়ার এক পর্বে যেমন বস্তুই মুখ্য আর এক পর্বে তেমনই প্রধান ভূমিকা মননের।

ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান, অনুভব, স্মৃতি, সংশয়, কল্পনা ইত্যাদি নিয়ে এত বিচার থাকলেও মননের সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য ঠিক ভাবনা বিষয়ে আলোচনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যে পদ্ধতিতে আমি নিম্নোধৃত দার্শনিক কবিতাটির মানে বুঝতে পারি (কবিতাটির নামও 'বোঝা') তাকে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, অনুপলব্ধি, অর্থাপত্তি কিছুই বলা যাবে না। নিছক শব্দবোধ বলতেও বাধে। অথচ আমি এখানে ঠিক কবিতাটির থেকে জন্মানো কাব্যরসস্বাদের কথা বলছি না। তা নিয়ে তো আলংকারিকরা খুবই সূক্ষ্ম বিচারবিমর্শ করেছেন। আমি বলছি সেই ভাবনাশৃঙ্খলের কথা, যা শঙ্খ ঘোষকে এই লাইন চারটি লিখিয়েছে --

'হঠাৎ কখনো যদি বোকা হয়ে যায়
কেউ, সে তো নিজে আর
বুঝতেও পারে না সেটা। যদি বুঝতোই
তা হলে তো বুঝদারই
বলা যেতো তাকে। তাই যদি তবে
তুমিও যে বোকা নও কী ভাবে বুঝলে
বলো তো?

কল্পনা ও যুক্তির যে যুগলবন্দীর মাধ্যমে দেকার্তে তাঁর প্রতারক দৈত্যের কল্পনা করে বর্হিজগৎকে সংশয় করেছিলেন সেরকমই এক কল্পিত সম্ভাবনা ও তার থেকে নিষ্কাশিত যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা প্রত্যেকেই যে বোকা নই বা হয়ে যাইনি সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব এ কথা বলতে চাইছেন কবি। তাঁর এই বিষয়ে ভাবার প্রক্রিয়াটি যদি শব্দ প্রয়োগের পূর্বেই ঘটে থাকে তা হলে সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যম কী ছিল? শব্দ দিয়ে যদি কেবল চিন্তাটির লেখক থেকে পাঠকের চিত্তে আগমন উপলক্ষ্যে পরিহিত পোশাক তৈরি হয়ে থাকে তা হলে চিন্তাটির শরীর কী দিয়ে তৈরি হয়েছিল? শঙ্খ ঘোষ বা অন্য কেউ ওই একই চিন্তাকে হিন্দি বা ইংরিজি বা ফরাসি শব্দাবলির জামাও পরাতে পারতেন। তা হলে বাংলা ইংরিজি হিন্দি বা ফরাসির বিকল্প বসন উন্মোচন করলে যে ভাবনাস্রোত বাকি থাকে তার ঢেউ কী উপাদানে গঠিত? এই

প্রশ্নের উত্তরে কেউ বলেন অবভাস, কেউ বলেন চিত্রকল্প, কেউ বলেন ধারণা বা কনসেপ্ট। 'বোকা' শব্দটি নয়, বোকা ধারণাটির মাধ্যমেই বোকা বিষয়ক ভাবনাটি সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি তাই হয় তা হলে আমার ভাবনা আমার মানসধারণার বিন্যাস। আমাদের দুজনেরই একই ভাবনা চলছে বা একই চিন্তা মাথায় এসেছে, আপনি যা মনে করেছেন আমিও হুবহু তাই মনে করেছি -- এসব কথা না-হয় অভেদ নয়, সমজাতীয়তার দ্বারা ব্যাখ্যা করা গেল -- আমি আর আপনি যদি একই কলম ব্যবহার করি বা একই খবরের কাগজ পড়ি, তার মানে এই নয় যে, একটিই বিশেষ কলম বা কাগজ আমরা ভাগাভাগি করে নিই। কিন্তু সমস্যা এ ক্ষেত্রে আরও গুতর - আমার ও আপনার কলম দুটি পাশাপাশি রেখে আমরা তুলনা করতে পারি। কিন্তু ভাবনা যদি আন্তর স্মৃতিচিত্র বা মানসধারণার শোভাযাত্রা হয় তা হলে তো কোনদিনই আমাদের পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় যে, আমরা একই জাতীয় ভাবনা ভেবেছি। সম্পূর্ণ নৈর্বত্তিক একলার ভাষা যে কারণে সম্ভব নয়, সেই কারণেই চিন্তার ভাষাই বা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মানসিক ধারণার দ্বারা গঠিত হলে ভাবনার সংক্রামণ বা পারস্পরিক সংবোধন সম্ভব হবে না।

৩

মানুষের জ্ঞানে ও আচরণে মননের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব যদি ব্যাহত হয় বস্তুর অনুপ্রবেশে, যদি মননকে অন্তত আংশিকভাবেও বস্তুজগতের কাছে তার আত্মসমর্পণ মেনে নিতে হয়, তাহলে আপাত-বিচারে মনে হতে পারে যে, মানবজীবনের সার্থকতা নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। প্রথমত, বলা যেতে পারে যে, জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সুনিশ্চিত লক্ষণ যখন তার মননশক্তি তখন জ্ঞান ও আচরণের জগতে মননের সার্বভৌম ভূমিকা অস্বীকৃত হলে পরিণামে খর্ব হয় মানুষের মূল্য ও মহিমা। দ্বিতীয়ত, এই আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, জ্ঞান ও আচরণ ক্রিয়া বস্তুর অবদান স্বীকার করে নেওয়ার ফলে মানুষের জীবন তার মহত্তর আদর্শ হারিয়ে বন্দী হয়ে পড়ে নীরস ও যান্ত্রিক বস্তুতান্ত্রিকতায়। তৃতীয়ত, প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মানুষের মননকে যদি কার্যত বস্তুজগতের কাছে বশ্যতা মেনে নিতে হয়, তাহলে মানুষ আদৌ তার চিন্তায় ও কর্মে স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে কী না।

এই সব প্রশ্নের মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রথমেই যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হল এই যে, প্রকৃতিগত বিচারে মনন ও বস্তু ভিন্নগোত্রীয় হলেও তারা কার্যক্ষেত্রে দুই সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী শক্তি নয়। কারণ বিমূর্ত মননের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রমাণ পাওয়া কেবলমাত্র তখন যখন তা প্রযুক্ত হয় বস্তুজগতে। অর্থাৎ বস্তুই হল মানুষের মনন শক্তির প্রয়োগের আধার। প্রসঙ্গত দেকার্তে মন ও বস্তুর সমন্বয় করতে পারেননি। তাই তিনি বলেছিলেন, এ দুটো আলাদা, পরস্পর নিরপেক্ষ। একটার সঙ্গে আরেকটার কোনও সম্পর্ক নেই। কী বলে আজকের বিজ্ঞান? প্রথমে জীববিজ্ঞানের বক্তব্য দেখা যাক, ১৯৮১-র নোবেলজয়ী মার্কিন মস্তিষ্ক-বিশেষজ্ঞ রজার স্পেরি বলেন--

'Current concepts of the mind-brain relations involve a direct break with the long-established materialist and behaviorist doctrine that has dominated neuroscience for many decades, Instead of renouncing or ignoring consciousness, the new interpretation gives full recognition to the primacy of inner conscious awareness as a causal reality,' (changing priorities, Neuroscience, Annual Review, 1981).

বিজ্ঞানের বস্তুবাদী তত্ত্ব মগজের নিউরনগুলির মিথস্ক্রিয়াকেই মন বলতে চায়। কিন্তু স্পেরি এখানে মনের আলাদা অস্তিত্ব ধরতে চাইছেন, যা বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে। অপর একজন নোবেলজয়ী, ব্রিটিশ স্নায়ু-শারীরবিদ স্যার জন ক্যারিউ এক্‌লস্‌ও এক দ্বৈতবাদী তত্ত্বের সমর্থক, যাতে primacy is given to the self conscious mind. অর্থাৎ জীববিজ্ঞানের তালেবর গবেষকরা বস্তুগত অদ্বৈতবাদ ছেড়ে আবার দ্বৈতবাদের দিকে ফিরে যেতে চাইছেন। আধিদৈবিকের আলাদা অস্তিত্ব তাঁরা আর অস্বীকার করতে পারছেন না। তবে এই দ্বৈতবাদ সমন্বয়কামী, এটি দেকার্তের সমান্তরাল দ্বৈতবাদ

থেকে আলাদা। পদার্থবিজ্ঞানীরা কিন্তু আরেকটু এগিয়ে। বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁরাও দ্বৈতবাদের স্তরেই ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছেন তুরীয় অদ্বৈতবাদের (Transcendental monism) দিকে। বস্তুবাদের উপর প্রথম আঘাতটা ছিল আইনস্টাইনের। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী বস্তুকে তিনি স্পেস-টাইমের ভাঁজ বানিয়ে দিয়েছিলেন, এই ভঁাজ সৃষ্টির কারণ মহাকর্ষ -- 'We may therefore regard matter as being constituted by the regions of space in which the field is extremely intense …….. There is no place in this new kind of physics both for the field and matter for the field is the only reality.' বস্তুকে নাকচ করার পর পদার্থবিদরা ক্রমশ চৈতন্যে গিয়ে পৌঁছলেন। প্রথমে তাঁরা পেলেন দর্শকের চৈতন্য, যা দ্রষ্টব্য বস্তু অর্থাৎ বস্তু অর্থাৎ কণাবস্তুকে প্রভাবিত করে। এরপর নোবেলজয়ী ইউজিন পল হিগনার একেবারে পরমচৈতন্যের দিকে ঝুঁকেছেন কেন? কারণ ততোদিনে দ্বিছিদ্র পরীক্ষা ও অন্যান্য গবেষণার দন বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে কণাগুলিও চৈতন্যময়। এভাবে বিজ্ঞানে বস্তুর অতিরিক্ত চৈতন্যের ধারণা এল। প্রথমে কেউ কেউ দ্বৈতবাদী হলেন এবং দুটোকেই সত্যি বলে ধরলেন। ঢেউ গতিবিদ্যার জনক এরউইন শ্রোয়েডিঙ্গার এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী চৈতন্যকে বহু খন্ডে বিভক্ত না ধরে এক ও অখন্ড ধরতে চাইলেন।

ব্রহ্মাণ্ডের স্পন্দমান মডেলের পরিবর্তে বেদান্ত দর্শনে 'ঊর্ণনাভ' বা মাকড়সা মডেল নেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছে এক 'পর'। পরের অর্ধেক পরার্ধ। প্রথম পরার্ধে প্রসারণ ঘটে, দ্বিতীয় পরার্ধে সঙ্কোচন। মাকড়সা যেমন জাল ছাড়ে এবং ইচ্ছে করলে পুরোটা গুটিয়ে নিতে পারে, ব্রহ্মাণ্ড তেমনি শূন্য থেকে প্রসারিত হতে শু করে এবং সঙ্কুচিত হয়ে শূন্যে পরিণত হয়। শূন্য বলতে এখানে অব্যক্ত অবস্থাকে বোঝাচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডের ব্যক্ত অবস্থা অনিত্য, তার জন্ম-মৃত্যু আছে। কিন্তু অব্যক্ত অবস্থাটি কি অনিত্য হতে পারে? একটা অসীম ও চিরন্তন ভাণ্ডার না থাকলে চক্রটা বরাবর চলবে কী করে? তাই অব্যক্ত অবস্থাটিকে অসীম ভাবা হয়েছে। মূল অবস্থাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্রহ্ম'। যা বাস্তব অর্থাৎ সত্যিই আছে ('তৎসৎ'), তাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কোন বস্তু নয়, তা পরমচৈতন্য। চৈতন্য ব্রহ্মের গুণ নয়, ব্রহ্ম স্বয়ং চৈতন্য। চিরন্তন হতে গেলে ব্রহ্ম অবস্থার শর্ত কী? জানি না। আমার মনে পড়ে কিছু পদার্থবিজ্ঞানীর কথা। যাঁরা ইদানীং বলছেন এক রোমহর্ষক সম্ভাবনার কথা। এই ব্রহ্মাণ্ড যে সিংগুলারিটির সন্তান তাঁর জন্ম হয়েছিল অন্য কোনও বিশ্বে। সেখানে এক পারটিক্‌ল অ্যাকসিলারেটরে দুই কণার সংঘর্ষে। সেই বিন্দু থেকে বিশ্ব। গ্যালক্সি। গ্রহ-নক্ষত্র। আমরা। সুতরাং আসুন, ক্ষণিকের জন্য আস্থা রাখি ও মেগা পয়েন্ট-এ। যিনি ঘনশ্যাম, কল্পনা কবি তাঁর স্বর্গরাজ্য, যেখানে পুনরায় আবির্ভূত হচেছন একজন ঋষিকবি। লিখছেন ' সোনার তরী'। একজন বিজ্ঞানী। আবিষ্কার করছেন আপেক্ষিকতা। কিংবা একজন সুরকার। বাজিয়ে চলেছেন নাইনথ সিমফনি।......

কিন্তু এই ভাববাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে এই কারণে যে, ভাবনা কেবলমাত্র এক বিমূর্ত ধারণা বা আদর্শ নয়; কাজেই সমস্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, মননের পরিমন্ডলে স্বনিয়ন্ত্রণ ক্রিয়ারত থাকলেই ভাবনার স্বাধীনতা সূচিত হবে এই তাত্ত্বিক অবস্থান ভ্রান্ত। মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা অভিব্যক্ত হয় তার কর্মময় উদ্যোগের মধ্য দিয়ে, যে উদ্যোগের ক্ষেত্র অবশ্যই মননের বাইরের বস্তুজগৎ। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বস্তুজগতে মানুষের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভের উদ্যোগে, পরাভাবের নয়। অর্থাৎ, মানুষ তার মননের শক্তি দিয়ে বস্তুজগতের উপাদানকে একের পর এক নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে ঋিলোকে প্রতিষ্ঠা করে নিজের স্বাধীনতার পথ। তাই-

'মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ।।

অর্থাৎ মনেতেই বন্ধ মনেতেই মুক্ত। কাজেই মানুষের বস্তুনির্ভরতা তার স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক নয়, কারণ মননের উদ্যোগেই তার এই বস্তুনির্ভরতা। মানবজীবন অচল হয়ে পড়বে তখনই যখন মানুষ তার মননের মোহে অস্বীকার করবে বস্তুকে। অতএব বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে মননের সক্রিয় উদ্যোগের ওপর। এই কারণেই "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে ।আমি চোখ মেললুম আকাশে - জ্বলে উঠল আলো পুবে পশ্চিমে।"

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com